This Book Downloaded From
http://Doridro.com

দুর্ঘটনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কেবিনের সামনের ডেক চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে মনোযোগটা বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। স্টিমার চলতে শুরু করে দিয়েছে, কাঠের চাকায় উঠছে আহত জলের ক্ষুব্ধ আর ক্রুদ্ধ গর্জন। কচুরির ঝাঁক ছিন্ন-ভিন্ন করে আর জলে সমুদ্রের ঢেউ জাগিয়ে স্টিমার এগিয়ে চলেছে। সকালের রোদে নদীর জল কাচের গুঁড়োর মতো জ্বলছে, ইলিশ মাছের সন্ধানে লম্বা জাল ছড়িয়ে নেচে চলেছে জেলে-ডিঙির বহর।

হাতের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে তখন ঘটনার ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। তিনটে খুন করে আর দুর্মূল্য পান্নার ড্রাগনটা হস্তগত করে দস্যু সর্দার ক্যাং চু পলাতক। বাঙালি ডিটেকটিভ সমুদ্র রায় তাকে ধরবার জন্য ইরাবতী নদী দিয়ে লঞ্চ ছুটিয়েছে পূর্ণবেগে। এমন সময় জলের তলায় প্রলংয়ঙ্কর শব্দে কী ফাটল? চুম্বক মাইন? কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু মুহূর্তে ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় লঞ্চ থেকে—

উত্তেজনায় গায়ের লোমগুলো যখন দাঁড়িয়ে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় ইন্দিরা চৌধুরী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বইটা মুখের সামনে ধরে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল কথাগুলো। স্টিমারের অবিশ্রাম গর্জনের মধ্য দিয়েও সেই কলকাকলি বেশ স্পষ্ট ভাবেই কানে আসতে লাগল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছে ফ্রন্ট ডেকের রেলিং ধরে—ইন্দিরার দিকে পিঠ দিয়ে। সুন্দর ছেলেটি, আরও সুন্দর মেয়েটি। বিশৃঙ্খল হাওয়ায় ওদের চুল উড়ছে, শাড়ী উড়ছে, উড়ছে পাঞ্জাবির প্রান্ত। বাতাসে ভাসছে একটা মৃদু-মধুর সুরভী। ওরা এখন নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন।

সত্যি বড্ড খিদে পেয়েছে। —ছেলেটির গলা।

মেয়েটি ধমক দিলে: তুমি বড্ড পেটুক বিভাস। স্টিমারে ওঠবার আগে অতগুলো খেয়ে এলেনা রেস্তোরাঁ থেকে? এখন আবার খেলে অসুখ করবে না?

—না, কিছুতেই না। ছেলেটি জোর গলায় প্রতিবাদ করলে: জানো, আমি ডাক্তার? আমাদের কখনও অসুখ করে না। সত্যি ইলু, তোমার টিফিন-ক্যারিয়ারের

গল্‌দা চিংড়িগুলো—

—আবার?—ইলু অথবা ইলা এবার কড়া ভাবে শাসন করে দিলে: ফের গল্‌দা চিংড়ির নাম করেছ কি টিফিন-ক্যারিয়ার সুদ্ধু নদীতে ফেলে দেব। দশটার আগে একটুকরো কিছু খেতে পাবে না। ডাক্তার। ছাই ডাক্তার তুমি! এম্‌-বি পাস করেছ খালি মানুষ মারতে।

শাসিত হয়ে বিভাস চুপ করে রইল। বোঝা গেল গল্‌দা চিংড়ির ব্যাপারে সে নিরাশ এবং মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ইলা কোমল স্বরে বললে, সত্যি লক্ষ্মীটি রাগ করে না। তোমার জন্যে খাবার আনা হয়েছে তুমিই তো খাবে। আমি বলছিলাম—

স্টিমার বাঁক ঘুরছে একটা। অসতর্ক নৌকোগুলোকে জানান দেবার জন্যে প্রচণ্ড গভীর রবে বাঁশি বাজিয়ে দিল দুবার। কয়েকটা কথা তার মধ্যে হারিয়ে গেল। বাকি কথাগুলো তেমনি অখণ্ড মনোযোগে শুনে যেতে লাগল ইন্দিরা। নিজের ব্যর্থ শূন্য জীবনটা পরিপূর্ণ যৌবন সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে এখনো মাঝে মাঝে লোলুপ হয়ে ওঠে।

ইলা বলে যাচ্ছে: আচ্ছা, এতটুকু কি রোমান্স নেই তোমার? বিয়ের পরে হনিমুন করতে চলেছ, কোথায় ভাল ভাল কবিতা মনে পড়বে, তা নয় গল্‌দা চিংড়ি আর গল্‌দা চিংড়ি!

—বোঝো না, মানুষ কেটে কেটে ভয়ানক রিয়ালিস্টিক হয়ে গেছি। এখনো কবিগরুর কবিতা মনে পড়ে বইকি, কিন্তু সে হচ্ছে:

"পাক-প্রণালীর মতে কোর তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবী নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন—"

—ওরে অকৃতজ্ঞ, কবে তোমাকে চামড়ার লুচি খাইয়েছি?

—অনেকদিন।

—মিথ্যেবাদী, ছোটলোক—ইলার ঝঙ্কার। তারপর খানিকটা দাম্পত্য কলহ, একঝলক মিষ্টি হাসি। সকালের রোদ, নদীর জল, নীলাঞ্জন আকাশ, স্টিমারের চাকায় জলের গর্জন, সব মিলে অপরূপ একটুকরো লিরিক কবিতা।

স্কুল মিসট্রেস কুরূপা ইন্দিরা চৌধুরীর বুকের ভেতরটা অকারণে পুড়ে যাচ্ছে। রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ—স্টিমারের প্যাড্‌লের মতো অশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত। গালে মুখে যেন একরাশ রক্ত-কণিকা এসে ঝিঁ ঝিঁ করছে। কোন ফাঁকে হাত থেকে রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাসটা খসে পড়ল।

ওদের কাছে এখন সমস্ত পৃথিবীর রঙই আলাদা। আকাশ-বাতাস-নদীর জন্য আর স্টিমারের বাঁশিতে যেন সানাইয়ের সুর উঠছে। শরতের রোদে দিগন্তটা যেন বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দৃষ্টির সামনে। স্টিমারের চাকায় তারই জলতরঙ্গ। আর শুধু পৃথিবীই নয়—ওদের এই মিলনোৎসবে চারিদিককার সমস্ত মানুষও যেন এসে যোগ দিয়েছে। যে-সমস্ত নিদ্রাতুর যাত্রী এই দিন-দুপুরেই ডেকের ওপর লম্বা হয়ে পড়েছে, অথবা মুরগীর ঝোলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যারা ঘোরাঘুরি করছে বাটলারের ঘরের সামনে, কিংবা এঞ্জিনের খোপরে ঢুকে যে সব কালিমাখা খালাসী কয়লা ঠেলছে বয়লারের গোলাপী আগুনে—তারা আর কেউ নয়, এই আনন্দিত বরযাত্রারই সঙ্গী। তাই পোড়ামুখ কুৎসিত ইন্দিরা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে নিতেও দেরী হল না ইলার।

ডেকে তিনজন। গল্প জমে গেল। কোথায় যাচ্ছেন, কী পরিচয়, কী করেন। বাড়িতে কে কে আছেন। কবে বিয়ে হল। আশা করি, দাম্পত্য-জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। আপনাদের দেখে ভারি ভাল লাগল—একেবারে আইডিয়াল কম্বিনেশন যাকে বলে।

বিকেল হয়ে এসেছে। নদীর জলে ছড়িয়ে পড়ছে রাঙা আলো। ইলার সুন্দর মুখে সেই আলো এসে অপরূপ মায়া ছড়িয়ে দিলে। আর সেই দিকে একবার চোখ বুলিয়ে গল্প করলে ইন্দিরা:

—জানতে চেয়েছেন আমার মুখটা এমনভাবে পুড়ল কী করে। ওটা নিতান্ত অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু ওকথা থাক। একটি মেয়ের গল্প বলি শুনুন। মনে করে নেবেন এটা সত্যি সত্যিই গল্প—এর মধ্যে বাস্তব কিছু নেই।

বিভাস আর ইলা একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলে। অর্থাৎ নিজের জীবনের কথাই বলতে যাচ্ছে ইন্দিরা। আত্ম-চরিত অথবা বাস্তব ঘটনা বলবার রেওয়াজই এই, গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করে নিতে হবে।

ইন্দিরা বললে, হ্যাঁ, নিতান্তই গল্প। স্টিমারে এর শুরু, স্টিমারেই এর শেষ। সুতরাং এর কিছুই বিশ্বাস করবেন না। মনে করবেন শুধু সময় কাটানো ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ইলার চোখ জ্বলজ্বল করছে আগ্রহে। বিভাস তাকিয়ে আছে সকৌতুক দৃষ্টিতে। দুজনেই সমস্বরে জবাব দিলে, আচ্ছা, বলুন আপনার গল্প।

স্টিমার চলছে পূর্ণবেগে। আকাশে ম্লান হয়ে আসছে আলো। দুপাশের গ্রামগুলো যেন স্বপ্নের একটুকরো ছবির মতো দেখাচ্ছে—উড়ে চলেছে গাং-শালিখের ঝাঁক, মাছরাঙারা পান্নায়-গড়া হালকা দেহ নিয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে ছোঁ মারছে জলে। জেলেদের জালে রূপোর মতো ঝলকাচ্ছে ইলিশ মাছ। নিচের থেকে আসছে স্টিমের আর খালাসীদের রান্নার একটা মিষ্টি মিশ্র গন্ধ।

ইন্দিরা বলতে শুরু করলে:

একটি মেয়ের গল্প। অসাধারণ কিছু নয়—সাধারণ মেয়ে। পথে ঘাটে যাদের দেখা, সংসারে যাদের সঙ্গে প্রত্যেকদিন সাক্ষাৎ, তাদেরই একজন। তাকে দেখলে কারো চোখ তার ওপরেই আটকে পড়ে না—অথবা চোখ ফিরিয়ে নেবারও দরকার হয় না। গ্রামে যারা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালায় এবং শহরে এসে যারা লেখাপড়া শিখেও সহজ ভাবে একা একা পথ চলতে পারে না, এই মেয়েটি তাদেরই দলে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সব কালো মেয়ের মুখে একটা চমৎকার লাবণ্যের আলো থাকে—অন্তত প্রথম বয়সে। ঝকঝকে প্রথম বয়সে। ঝকঝকে ফর্সা রঙ সে আলোক ম্লান করে রাখে, কিন্তু শান্ত শ্যামলতার ভেতর দিয়ে তা ঠিকরে পড়ে প্রাণের আলোর মতো। ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে একে দেখা যায় না—যারা দেখে তারা ভুলতে পারে না। একটা জিনিস মনে রাখবেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মেয়ের প্রেমে যারা পড়েছে তাদের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কালো মেয়েকে যারা ভালবেসেছে তাদের উদ্ধারের বিন্দুমাত্র আশা নেই।

আমি যে মেয়েটির কথা বলছি—ধরুন তার নাম লক্ষ্মী—এই লাবণ্যের আর্শীবাদ সে-ও পেয়েছিল। লেখাপড়া মন্দ করেনি, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল। তারপরে তার বিয়ে হয়ে গেল, যেমন করে এই সব মেয়েদের হয়। প্রেমে পড়ে নয়, সিভিল ম্যারেজে নয়—বাপ-মায়ের পছন্দ করা একটি সাধারণ বাঙালি ছেলের সঙ্গে! তার নাম মনে করুন সত্যেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করে, কলকাতায় নিজের একখানা দোতলা বাড়ি আছে, আছে বাপ-মা-ভাইবোন। গল্পের নায়ক হবার মতো কোন গুণ নেই, না রেমিও, না ডন-জুয়ান। কালো রঙের একটি ছেলে মাঝারি ধরনের বি-এ পাস করে ঢুকেছিল চাকরিতে।

কিন্তু লক্ষ্মী সুখী হয়েছিল—সুখী হয়েছিল সত্যেনও। অফিস পালিয়ে দুপুরে সত্যেন আসত বাড়িতে, স্ত্রীকে নিয়ে যেত বিলিতী বায়স্কোপে ম্যাটিনির ছবি দেখতে। সন্ধ্যায় লেকের ধারে বসে 'হ্যাপি বয়' আইসক্রিম খেত, আউটরাম ঘাটের পাশে ছায়াঘেরা লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে দেখত রেঙ্গুনের জাহাজ আর গঙ্গার জলে দিনান্তের আলোর ঝলক। সূর্য ডুবে যেত; হাওড়ার আকাশে উঠত চাঁদ, গুন্ গুন্ করে লক্ষ্মী গান গাইত: 'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে'—

বেশ কাটছিল, কিন্তু কাটল না। সত্যেনের দেখা দিল প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মা।

ইন্দিরা চশমার কাচ মুছে নেবার জন্যে চুপ করলে এক মুহূর্তের জন্যে। নদীর পূব পাড়ে গ্রামগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়ে নেমেছে সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে এখনো জ্বলন্ত তারার রক্তরাগ। স্টিমারের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সার্চলাইটের আলো দূরে নারিকেল বীথি সমাকীর্ণ নদীর বাঁকটাকে উদ্ভাসিত করে দিলে। এদিকে ইলা আর বিভাস নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইন্দিরার মুখের দিকে!

ইলার স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল: যক্ষ্মা?

ইন্দিরা চশমাটা পরে নিলে। কাচের ওপরে ইলেকট্রিকের আলো পড়ে যেন ইন্দিরার চোখ দুটোই জ্বলতে লাগল: হ্যাঁ যক্ষ্মা। এসব কাব্যের এরকম বিয়োগান্ত পরিণতিও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কী করা যাবে উপায় নেই।

চিকিৎসা চলতে লাগল। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত যা কিছু দিয়ে লক্ষ্মীর গয়না বন্ধক দিয়ে। কিন্তু কোন লাভ নেই—সকলেই বুঝতে পারছিল যা অনিবার্য তাই ঘনিয়ে আসছে। লক্ষ্মীর মনের অবস্থা আপনারা অনুমান করতে পারেন, সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলব না। তবু যখন একবিন্দু আশা থাকে না—তখনো আশা করতে ছাড়ে না মানুষ। হয়ত লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সবাই যখন ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, তখন আরো বেশি করে ভরসা পাচ্ছে সত্যেন। এ রোগের নাকি ধর্মই এই। তার ধারণা সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই। বাস্তবিক, আগের চাইতে তার বাইরের স্বাস্থ্য সেরেও গিয়েছিল অনেকটা। সত্যেন খুঁত খুঁত করতে লাগল: এভাবে আমাকে আলাদা করে রাখবার দরকার নেই, আমি সকলের সঙ্গে মিশব, সকলের সঙ্গে খাব। লক্ষ্মীই বা এমন করে দূরে থাকবে কেন? আমার কাছে স্বচ্ছন্দেই আসতে পারে এখন।

শেষ কথাটাই সত্যেনের আসল লক্ষ্য। কিন্তু বাড়ির নতুন ডাক্তার—ধরা যাক তার নাম বিভাস—

বিভাস আর ইলা একসঙ্গে চমকে উঠল। বিভাস?

ইন্দিরা হেসে উঠল: মনে করুন কাল্পনিক নাম। সামনে যাকে পাওয়া যায়,তাকে মডেল করে নিয়ে গল্প বলতে সুবিধা হয় না? তা ছাড়া বিভাস নামে আর একজন ডাক্তার থাকলেই বা ক্ষতি কী?

ইলার মুখে প্রতিবাদ ঘনিয়ে এল, কিন্তু বিভাস কৌতুক বোধ করছিল। বললে, না, না ক্ষতি নেই। আপনি বলে যান।

—কী বলছিলাম?—কৌতুকময় স্মিত হাস্যে ইন্দিরা একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে ইলার দিকে: লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার জন্যে সত্যেন যেন দিনের পর দিন উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগল। এটাও নাকি এ রোগের আরো একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। ভেতরে যত ক্ষয়ে আসে, অতৃপ্ত ক্ষুধাগুলো তত বেশি তীব্র হয়। কিন্তু তরুণ ডাক্তার বিভাসের—ইন্দিরা একবার থামল: বিভাসের কড়া নিষেধ—যে কোন রকম উত্তেজনা রোগীর পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং লক্ষ্মীর স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার ছিল না।

তা ছাড়া আরো একটু ব্যাপার ছিল—যা আর কেউ বুঝতে না পারলেও লক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়ায়নি। দিনের পর দিন রোগীর চিকিৎসায় নিঃস্ব হয়ে আসা এই পরিবারটির

প্রতি জেগে উঠেছিল বিভাসের একটা অহৈতুকী সমবেদনা। শেষ পর্যন্ত সে দুবেলা যাতায়াত করতে শুরু করলে। ফী চাওয়া তো দূরের কথা, সে সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই জিভ কেটে তিন হাত পিছিয়ে দাঁড়াত। বলত, না, না, টাকা আর কেন, এ তো আমার কর্তব্যই—

দরিদ্র পরিবারটি তাতে অপমানিত হল না, বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিন্তু নতুন ডাক্তার—বিশেষ করে তরুণ ডাক্তারদের কর্তব্য-বোধ ক্ষেত্র বিশেষে মাঝে মাঝে মারাত্মক হয়ে ওঠে। না—না বিভাসবাবু, কিছু মনে করবেন না, এ কটাক্ষ আপনাকে নয়। এটা আমি সাধারণ ভাবেই বলছি—একেবারে দায়িত্বহীন উক্তি বলেই আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন।

যাই হোক, কর্তব্যের তাগিদেই নতুন ডাক্তার একদিন একঝুড়ি ফল নিয়ে এল। লক্ষ্মী তখন দাঁড়িয়েছিল বারান্দার পাশে—ম্লান বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল, সামনের বড় বাড়িটার মাথার ওপর রক্ত মাখিয়ে সূর্য অস্তে নামছে। হয়ত তার মনে পড়েছিল আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যা, সেই ঝলমলে জল—সেই ঘাট ছেড়ে আসা দূরের পথিক, কালো কালো জাহাজগুলোর গম্ভীর উদাস বাঁশির সুর।

বিভাস বললে, আপনাকে ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে—যেন একখানা আঁকা ছবির মতো।

লক্ষ্মী চমকে পেছনে তাকাল। বিকালের আলোয় বিভাসের চোখে যে আগুন মেয়েদের অত্যন্ত বেশি চেনা-যেমন পাখিমাত্রেই বন্দুকের নল দেখলে চিনতে পারে।

বিভাসের মুখ কালো হয়ে উঠছিল। হঠাৎ যেন তীব্র ভাবে বলে ফেলল, থাক আপনার গল্প আর ভাল লাগছে না, মিস চৌধুরী মাপ করবেন।

কিন্তু ইলেকট্রিকের আলোয় ইলার মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে আশ্চর্য ভাবে। তেমনি তীব্র ভাবেই ইলা বললে, না, না, বেশ লাগছে। বলে যান আপনি।

বিভাস কিংবা ইলা কারো কথাই যেন শুনতে পায় নি এইভাবে ইন্দিরা বলে চলল—বিদ্যুৎগতিতে চলে যাচ্ছিল লক্ষ্মী, কিন্তু বিভাস তার পথ আটকাল। বললে আপনার স্বামীর জন্যে এই ফল—

—মাকে দেবেন—তীক্ষ্ণ গলায় লক্ষ্মী জবাব দিয়ে চলে গেল।

শাশুড়িকে বিভাস কী বলেছিল কেউ জানে না, কিন্তু আড়ালে তিনি লক্ষ্মীকে খানিকটা গালিগালাজ করলেন। বললেন, বৌমা সতু যেমন, ও-ওতো তেমনি ঘরের ছেলে। এই দুঃসময়ে কত কী করছে—তুমি ওকে অপমান করলে কেন?

লক্ষ্মী জবাব দিল না, জবাব দেবার কিছু ছিলও না। বিভাসের উপকারের জালে এই দুঃস্থ পরিবারটি কেমন করে দিনের পর দিন জড়িয়ে যাচ্ছে—কেমন অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করছে, এ তো সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিল। বিভাসের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য করলে শ্বশুর-শাশুড়ি যে একসঙ্গেই তার ওপর

খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন, এ কথা বুঝতে তার বাকি ছিল না।

ওদিকে সত্যেন দিনের পর দিন কেমন হয়ে উঠছে। তার মনের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলে যাচ্ছে লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার কামনা। খাবারের বাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আছড়ে ভেঙে ফেলে ওষুধের গ্লাস। জাগরণক্লান্ত রাত্রিতে জানলায় বসে বসে লক্ষ্মী শুনতে পায় খাঁচায় আটকানো একটা বুনো জানোয়ারের মতো সত্যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

সেদিন জ্যোৎস্নায় বান ডেকে গিয়েছিল। নিশীথ রাত্রে কলকাতায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত চাঁদ ওঠে। দিনের সমস্ত শব্দ আর সমস্ত কুশ্রীতা যায় তলিয়ে, শান্ত, স্তব্ধ, কোমল ঘুমের ওপরে জ্যোৎস্না যেন ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে মানুষ তখন ঘুমে কাতর—জ্যোৎস্নার সেই ফুল তারা কুড়িয়ে নিতে পারে না। আর লক্ষ্মীর মতো যারা সেই রাত্রিতে প্রহর জাগে, তাদের চোখে সে জ্যোৎস্না যেন দেখা দেয় কঙ্কালের খানিকটা হাসির মতো—আজন্ম বৈধব্যের নির্মম নিষ্ঠুর শুভ্রতার মতো।

রেলিং ধরে ঝুঁকে দাড়িয়েছিল লক্ষ্মী। গালের দুপাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এমন সময় তার ঘাড়ে আগুন ছুঁইয়ে গেল তীব্র একটা নিঃশ্বাসের হলকা। চকিত হয়ে পেছনে ফিরতেই কে তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরলে। বুনো জানোয়ারের চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে—সত্যেন।

লক্ষ্মী বললে, একি, তুমি!

সত্যেন জবাব দিল না। তেমনি লোহার মতো কঠিন দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে ঘরে টেনে নিয়ে চলল। তার মধ্যে বহুদিনের উপবাসী পশুটা জেগে উঠেছে।

লক্ষ্মী প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল:—কী করছ, কী করছ তুমি পাগলের মতো? সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। পায়ে পড়ি তোমার আজ ছেড়ে দাও। তোমার শরীর সেরে উঠুক—

সত্যেন তবুও জবাব দিল না। তার গায়ে যেন পাঁচটা হাতির বল এসেছে। লক্ষ্মীর কান্না, মিনতি কিছুই তার কানে গেল না, সে পাগল হয়ে গেছে। স্ত্রীকে দুহাতে তুলে সত্যেন ঘরে নিয়ে এল।

ফলাফল রাতারাতি টের পাওয়া গেল। শেষবারের মতো এক ঝলক রক্ত তুললে সত্যেন। লক্ষ্মীর কাছ থেকে এ জন্মের শেষ পাওনা আদায় করে সে চলে গেল—বিধবা হল লক্ষ্মী।

ইন্দিরা থামল। নদীর বুকে গাঢ় অমাবস্যার রাত্রি। হু হু করে হাওয়া আসছে। সার্চলাইটের আলো তেমনি চমক ফেলেছে নিশীথের তরঙ্গিত খরধারায়, দু তীরের মর্মরিত সুপারি আর নারিকেলের বীথিতে। বিভাসের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত—ইলার মুখে সমবেদনার ম্লান রেখা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলা বললে, গল্প শেষ হল আপনার?

—না, হল আর কই। এ সব সাধারণ গল্প—প্রতিদিনের সংসারের গল্প। এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যেমন করে প্রত্যেদিনের জীবন চলে, এ গল্পও তেমনি খাওয়া-বসা-চলা-ফেরায় এগিয়ে চলতে থাকে। তবু আর একটুখানি বলেই আমি গল্পটা শেষ করব, আপনাদের আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না।

ইন্দিরা বলতে লাগল: লক্ষ্মী বিধবা হল। বাঙালির ঘরের শাশুড়িরা ছেলের শোকে যেভাবে চীৎকার করে কাঁদেন, সত্যেনের মাও তেমনি করে কাঁদতে লাগলেন, তেমনি করেই গালমন্দ দিতে লাগলেন অলক্ষণা ছেলের বউকে। বিয়ের একবছরের মধ্যেই যে রাক্ষসী জলজ্যান্ত স্বামীকে এভাবে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, তার সাজানো সংসারে এমন ভাবে আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে তাকে তিনি যে একবিন্দু ক্ষমা করতে পারেন না, এর মধ্যে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

গালাগালি সহ্য করেও লক্ষ্মী পড়ে রইল স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরেই, দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় বয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রবৃত্তি সে বোধ করল না। দিন কয়েক—দিন কয়েক কেন, মাস কয়েক কাটাল একটা বিরাট শোকোচ্ছ্বাসের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে। কোন ক্ষতিই কারো অপূর্ণ থাকে না—এও রইল না।

এ দিকে সংসারের অবস্থা ক্রমেই অচল হয়ে আসবার উপক্রম করছে। ব্যাঙ্কে পুঁজি যা ছিল, সত্যেনের চিকিৎসাতেই তা শেষ হয়েছে। ঋণের বোঝাও ভারী হয়ে উঠেছে নেহাৎ মন্দ নয়। শ্বশুর যা পেন্‌সেন পান তা নামে মাত্র, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। দেনার কিস্তি শোধ না করলে শেষ সম্বল বাড়িখানাও চলে যায়—আর বাড়ি বাঁচাতে গেলে মাসের দশদিন উপোস দিতে হয় গুষ্টিসুদ্ধ সকলকে।

লক্ষ্মীর আই-এ পাস করা বিদ্যেটা কাজে লাগল এতদিনে। পাড়ায় একটা ইস্কুলে ছোটমতন একটুখানি চাকরি সে জোগাড় করে নিলে। কাদায়-আটকে বসা পারিবারিক চাকাটা নড়ে উঠল, চলতে শুরু করলে একটু একটু করে। সংসারে অলক্ষণা বিধবা বউয়ের প্রতি গালিবর্ষণটা কমে এল, তার মূল্য বাড়ল, এমন কি খানিকটা আদরও জুটল বলা যায়। কোন কোন দিন ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখত বুড়ি শাশুড়ি উনুনের আঁচে বসে তার জন্যে খাবার তৈরি করছেন।

দিন কাটছিল, হয়ত এমনি করেই কেটে যেত। লক্ষ্মী ভুলে যেত নিজেকে, শ্বশুর-শাশুড়ি ভুলে যেতেন সংসার থেকে সত্যেনের ক্ষতচিহ্নটাকেও। তারপরে দূর ভবিষ্যতে হয়ত এও দেখা যেত যে একরকম করে নিজের মধ্যেই লক্ষ্মী সুখী হয়ে উঠেছে। জীবনের ধর্মই মানিয়ে চলা, স্বীকার করে নেওয়া—লক্ষ্মীর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হত না।

কিন্তু যা হত তা হল না। এল রাহু। কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার বিভাস সত্যেনের

মৃত্যুর পরেও এ বাড়িতে তার কর্তব্যকে ভুলতে পারল না।

সত্যেনের জন্যে আর ফুলের ঝুড়ির দরকার নেই, কিন্তু শাশুড়ির জন্যে আছে। বুড়ো বয়সে মিষ্টি খাবার লোভ হয় মানুষের, বিভাস বাক্স বোঝাই করে ভাল ভাল সন্দেশ আমদানি করতে লাগল। বিজয়ার দিনে অকারণে দশ টাকার নোট দিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করে গেল। তিনি আপত্তি করলে বিভাস ম্লানমুখে বললে, আমাকে এমন পর করে দেখছেন কেন? সত্যেন আমার বন্ধু ছিল, তার শূন্য জায়গাতে আমার কি এতটুকু দাবি নেই?

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে বিভাস। শ্বশুরের চোখে জল এল। তিনি বললেন, না বাবা, একজন গেছে, তার জায়গায় তোমাকে পেয়েছি খানিকটা অন্তত। তোমাকে কি পর ভাবতে পারি কখনো?

কিন্তু সত্যেনের সব শূন্যস্থানেই বিভাস নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে লাগল, এমন কি লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও।

শ্বশুর-শাশুড়ি কিছু বুঝতে পারছিলেন কি না তা কে জানে। যদিও বুঝে থাকেন তা হলেও বোধ হয় তখন তাদের করবার কিছু ছিল না। দারিদ্র আনে অপরিহার্য ক্ষুদ্রতাকে বহন করে—আনে লোভ। আরো বিশেষ করে সে দারিদ্র যখন অসহায়—নতুন আশ্বাস আর নতুন উৎসাহে বুক বেঁধে চলবার ক্ষমতা যার নেই, সে চোখ বুজেই কোন একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করতে চায়। সেটা দড়ি কিংবা সাপ একটা কিছু হলেই হল—সাময়িক আশ্বাসটাই তার পক্ষে বড় কথা। লক্ষ্মী তখন শোনেনি, পরে শুনেছিল বিভাস শ্বশুরকে নাকি তিনশো টাকা ধার দিয়েছে এবং সে টাকা ফেরৎ পাবার জন্যে তার কিছুমাত্রও তাগিদ নেই।

এমন হয়ত হতে পারে যে এই পরিবারটির উপরে বিভাসের খানিকটা মায়া বসে গিয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন তা থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল তার লক্ষ্মীর প্রতি লোভ, একটা অপরিসীম লোলুপতা। অচম্‌কা ঘরে ঢুকে বলে বসত, বৌদি অমন করে বসে আছেন কেন? আসুন না, একটু গল্প করি।

খানিকটা পরিমাণে স্বীকার না করেও উপায় ছিল না বিভাসকে। সে এখন এ বাড়িতে ছোটছেলের মর্যাদা লাভ করেছে, লক্ষ্মীর পরম স্নেহভাজন দেবর। এবং দেবর হিসাবে খানিকটা বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় সে নিশ্চয় পেতে পারে, এ সম্পর্কে কোন অনুযোগ জানাতে গেলে খানিকটা গাল-মন্দই লাভ হবে।

সেদিন রবিবারের ছুটি।

শ্বশুর শাশুড়ি গেছেন গঙ্গাস্নান করতে। ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়িতে ভালুক-নাচ দেখছিল। আর স্নান শেষ করে এসে দোতলায় আয়নার সামনে চুল বাঁধছিল লক্ষ্মী।

এমন সময় আয়নায় ছায়া পড়ল। চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে বিভাস ঘরে

চলে এসেছে। বললে, বৌদি!

রাগে লক্ষ্মীর চোখ-মুখ রাঙা হয়ে গেল।

—আপনি এমন ভাবে আমার ঘরে এলেন কেন?

—কেন, আসতে নেই?—বিভাস বেশ আরাম করে লক্ষ্মীর খাটের ওপরে জাঁকিয়ে বসল: সত্যি যত দিন যাচ্ছে বৌদির রূপ তত বেশি খুলছে, যেন তপঃকৃশা পার্বতী।

অসহ্য ক্রোধে লক্ষ্মী বললে, আপনার স্তুতি আমার দরকার নেই। এমন সময়ে আপনি আমার ঘরে আসবেন না—পাড়ার লোক দেখলে কী ভাববে বলুন তো?

—কী ভাববে?—বিভাসের মুখে শয়তানের হাসি দুলে উঠল: কী ভাববে বলো না লক্ষ্মীটি? সত্যি, লক্ষ্মী নামটা তোমার সার্থক।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল—জবাব দিল না।

সত্যেনের জায়গা এ বাড়িতে আমি পেয়েছি। তার লক্ষ্মীকেই বা পাব না কেন?—বলতে বলতে বিভাস উঠে দাঁড়াল, তারপর আলগা একটা টান দিয়ে লক্ষ্মীকে একেবারে বুকের ওপর নিয়ে এল।

মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না। পলকের জন্য মনে হল সে যেন মরে গেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই একটা প্রবল ধাক্কায় বিভাস ছিটকে দেওয়ালের দিকে চলে গেল, সশব্দে ঠুকে গেল তার মাথাটা।

বিমূঢ় হয়ে বিভাস তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার। চাপা কঠিন গলায় জবাব দিলে, বেশ।

সেই যে বিভাস লক্ষ্মীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একমাসের মধ্যে এ বাড়িতে আর পা দিল না। আর লজ্জায় অপমানে বিছানায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল লক্ষ্মী। একথা কাউকে বলবার নয়, কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং বৈধব্যের অপরাধে কলঙ্কের সমস্ত বোঝাটা তারই ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে।

কিন্তু বিভাসেরও দিন আসছিল। এল যথা সময়ে।

পাড়ায় ভয়ঙ্কর হাম হচ্ছে। বাড়িতে ছেলেপিলের হয়েছে, লক্ষ্মীরও হল। যেমন তীব্র জ্বর, তেমনি তীব্র যন্ত্রণা। তিনটে দিন সে চোখ মেলেও তাকাতে পারল না—দেখতে পেল না তার চারদিকে কী ঘটছে বা না ঘটছে।

সেই সময়ে নিরুপায় শ্বশুর বিভাসকে ডেকে নিয়ে এলেন।

নতুন ডাক্তার কর্তব্যপরায়ণ। সে ভাল ওষুধই এনে দিল। প্রেসক্রিপশন করে নয়, নিজের হাতেই ওষুধ নিয়ে এল। বললে, এইটে মুখে মাখিয়ে দেবেন, হামগুলো তাড়াতাড়ি উঠে যাবে। কোন স্পটও থাকবে না।

মুখের ওষুধের তুলি পড়তেই আচ্ছন্ন অচেতন লক্ষ্মী অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে বসল।

সমস্ত মুখে কে যেন খানিকটা তরল আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। আঙুল লাগাতেই সঙ্গে সঙ্গে পোড়া চামড়া উঠে আসতে লাগল, বেরিয়ে পড়ল লাল টকটকে দগদগে ঘা। চিরদিনের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়ে গেল লক্ষ্মী।

স্টিমারের বাঁশি হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠল। সামনে একটা বন্দরের ওপরে সার্চলাইটের দীপ্তি পড়েছে। ইন্দিরা উঠে দাঁড়াল। বললে, এই স্টেশনে আমি নামব। ধন্যবাদ, অনেক আনন্দ পাওয়া গেল আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে।

ইলা ব্যাকুল হয়ে বললে, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ঘাটে লাগতে তো আরো কয়েক মিনিট দেরী আছে। তার পরে কী হল বলুন।

সুটকেসটা তুলে নিয়ে ইন্দিরা হাসল: কী আর হবে। বিভাসের নামে কেস করা যেত। কিন্তু প্রমাণ তো করা চাই। ওষুধের শিশিটা যে সে-ই এনে দিয়েছিল কী করে বলা যাবে? তা ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়িও কি চাইতেন ঘরের কেলেঙ্কারি নিয়ে খবরের কাগজে টানাটানি হয়? তাঁদের না ছিল টাকা, না ছিল সহায়।

নীচে খালাসীদের চীৎকার: হাফিজ, হাফিজ।—স্টিমার ঘাটে ভিড়ছে, শোনা যাচ্ছে মানুষের কোলাহল। ইন্দিরা বললে, আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার।

দোতলায় সিঁড়ির মুখে কী ভেবে আবার থেমে দাঁড়াল ইন্দিরা। মুখ ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ, আর একটা কথা। লক্ষ্মী শেষে খবর পেয়েছে বিভাসের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে, এই আপনার মতোই অনেকটা।

সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল ইন্দিরা।

বিভাস কাষ্ঠ হাসি হাসল: দেখছ ইলু, কী চমৎকার একটা গল্প বানিয়ে—

কিন্তু ইলা জবাব দিল না। দু-চোখে তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের আগুন ছড়িয়ে কেবিনে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাতর বিভাস ডাকতে লাগল: ইলা শোনো, শোনো—

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

স্টিমার থেকে নেমে ইন্দিরা হেঁটে চলেছে পথ দিয়ে। সত্যিই বানিয়ে বলা গল্প। নিজের সব ভেঙে গেছে বলেই যা কিছু সুন্দর দেখতে পায় তাকেই কি তার ভাঙতে ভাল লাগে? তার মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল কোন ডাক্তারের অ্যাসিডে নয়, নিছক একটা স্টোভ দুর্ঘটনাতেই।